জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : একটি পর্যবেক্ষণ

চিররঞ্জন সরকার

> "নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।
>
> কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।" —*স্ত্রীশিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। এটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি নানা ধরনের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনো যথেষ্ট জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। প্রতিবছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে, অনেকে বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে। ফলে ওই মেয়েদের জীবন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। এই বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমসুযোগ তৈরি করা এবং একই সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক সবার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন। জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি করে মেয়েদের ঝরে পড়া ও বাল্যবিয়ে রোধ করার কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কাজেই এই উদ্যোগ সফল করে তুলতে একক ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা কী

সহজভাবে বললে শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে কাউকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত না করা এবং ছেলে হওয়ার কারণে বাড়তি সুবিধা না দিয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ ও মর্যাদা দেওয়ার সংস্কৃতিই হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা সমাজে নারী ও পুরুষ একইরকম দায়দায়িত্ব পালন করবে, একইরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিনিময়ে একই মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে— এটাই প্রত্যাশিত। এ বিষয়টি মনে রেখে ও গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি কাজে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলা হয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে নানাভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য দেখা যায়। শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি-বাকরি, অভিজ্ঞতা, মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, নেতৃত্ব প্রদান, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান ইত্যাদি সকল দিক থেকেই নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে। অথচ উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এ অবস্থা মোটেও কাম্য নয়। তাই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়োগ, কর্মবণ্টন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমান গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

নারী-পুরুষ বা ছেলে-মেয়ে উভয়কে নিয়েই আমাদের সমাজ। সমাজে নারী-পুরুষের সামর্থ্য-যোগ্যতা এক হলেও উভয়ের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা যদি উভয়ের জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তাহলে উভয়েই তাদের সেরাটা দিতে পারে। তাহলে সমাজের অনেক বেশি কল্যাণ হয়। এই বোধ ও মনোভাবই হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

জেন্ডার কী

জেন্ডার সংবেদনশীলতা কী সেটা জানার পাশাপাশি আমাদের জেন্ডার সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। নারী এবং পুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতিই হচ্ছে জেন্ডার, যা নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

শারীরিক কিছু পার্থক্য নিয়ে নারী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি যখন এই পার্থক্য এবং অন্যান্য কারণে তাদের ওপর নানা মানে ও দায়দায়িত্ব আরোপ করে আলাদা করে ফেলে, তখনই তা হয়ে ওঠে জেন্ডার। তাই জেন্ডার এক ধরনের সামাজিক নির্মাণ। অন্যদিকে, শারীরিক পার্থক্যকে বলা হয় 'সেক্স'। এই পার্থক্য জৈবিক বলে তা দূর করা যায় না। কিন্তু সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়, দায়দায়িত্ব পরিবর্তন করা যায়। নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য দূর করে জেন্ডারবান্ধব সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

নারী ও পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত সংজ্ঞাই হচ্ছে জেন্ডার। প্রকৃতি ছেলে ও মেয়েশিশু তৈরি করে; সমাজ তাদের বৈষম্যের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীতে পরিণত করে। সমাজই তৈরি করেছে পুরুষালি ও মেয়েলি বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি বৈষম্য তৈরি করে নি, তৈরি করেছে নারীর পুনরুৎপাদনমূলক (রিপ্রোডাকটিভ) কাজের জন্য বিশেষায়িত অঙ্গ। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, কালো-সাদা, নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য ও ব্যবধান তার সবই সমাজের তৈরি। জেন্ডার বৈষম্যের মাশুল শুধু নারীকেই দিতে হয় না, পুরুষ এবং সাধারণভাবে সমাজকেও এজন্য মাশুল দিতে হয়।

অসংবেদনশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বলা চলে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা ছোট আকারের সমাজ। সমাজে যা কিছু পক্ষপাত, বৈষম্য, তার প্রতিফলন পড়ে স্কুলেও। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম, আলাদা খেলাধুলার সরঞ্জাম, ছেলেদের দিয়ে মাঠ পরিষ্কার, মেয়েদের দিয়ে ক্লাসরুম ঝাড়ু দেওয়া, এমন নানা ধরনের বিভাজন চলতে থাকে। এই বিভাজনকে 'সমস্যা' না ভেবে 'স্বাভাবিক' ভাবতেই অভ্যস্ত অধিকাংশ শিক্ষক।

অনেকে মুখে বলেন, 'আমি ছেলে-মেয়েতে পার্থক্য করি না', কিন্তু মেয়ে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ চাইলে তা কিনে দেওয়া হয় না। বড়জোর দেওয়া হয় গয়না বা পোশাক। সমাজের অভ্যাস প্রভাবিত করে বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও শৈশব-কৈশোরেই এই পার্থক্যের বোধ ঢুকে যায়। সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে, এমন এক ছাত্র ও ছাত্রীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন শিক্ষক। ছেলেটি স্পষ্ট বলে, 'তাতে কী স্যার! আমি তো ছেলে।' অন্যদিকে, মেয়েটি কেঁদে ফেলে এবং কাউকে না জানানোর অনুরোধ করতে থাকে বারবার। এভাবেই স্কুল-কলেজে জেন্ডার নির্মাণ চলতে থাকে।

তবে কি এমনটাই চলবে? বৈষম্যের ধারাপাতে মেয়েরা কি আত্মপ্রত্যয়হীন, বিষাদগ্রস্ত হয়েই বাঁচবে? ছেলেরা নিজেদের 'হিরো' ইমেজ নিয়ে ঘুরবে চিরকাল? নাকি শিক্ষায়, স্কুলের পরিবেশে পরিবর্তন

আসবে? জেন্ডার-বৈষম্যের যে বীজ প্রোথিত আছে সিলেবাসে, স্কুলের ব্যবহারিক বিধিতে বা প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসে, তাকে সমূলে নাশ করবার ব্যাপারে আলোচনায় সবাই একমত হন। কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব তা নিয়ে ভাবনা বিশেষ এগোয় না। পাঠদানে পরিবর্তন, নতুন নতুন পাঠ্যবই বা 'অ্যাক্টিভিটি'-মূলক পাঠ, শিক্ষকদের নিয়ে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা, ক্লাসে জীবনশৈলী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা— এর কোনটা কাজে দেবে বেশি? এসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়; কিন্তু নতুন পথে হাঁটা তো দরকার। সেই কাজটা আজকের প্রজন্মকেই শুরু করতে হবে।

পুরুষের তৈরি নিয়মনীতির জেরে নারীরা বঞ্চিত

সমাজের বেশিরভাগ নিয়মনীতি তৈরি করে পুরুষরা। আর যারা যেটা তৈরি করে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা নিজেদের স্বার্থেই করে। যে পুরুষরা সমাজের নিয়মনীতি তৈরি করে, তারা জেনেশুনে বা অগোচরে নারীর বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ এতে তাদের সুবিধে হয়; যেমন, পুরুষরা কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে বিভাজন তৈরি করেছে। রান্নাবান্না ও ঘর-গেরস্থালির কাজকে বলা হয়েছে মেয়েদের কাজ। আর পুরুষরা হাট-বাজারে যাবে, আড্ডা দিবে, চা-পানি খেয়ে আমোদ করবে। এই কাজগুলো মেয়েরা করলে পুরুষরা বেজায় চটে যায়।

আমাদের সমাজের নিয়মনীতিগুলো তৈরি করেছে পুরুষরা। এই নিয়মনীতি অনুযায়ী ছেলেরা কী করবে, মেয়েরা কী করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আমরা অবাক হই। অনেক ক্ষেত্রে এর প্রতিবাদও করি। কারণ পুরুষের তৈরি নিয়মনীতিতে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, নারীকেও দেখি পুরুষের চোখ দিয়ে, পুরুষের তৈরি রীতিনীতির আলোকে। কয়েকটি উদারহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ক. নারীর পোশাকে পকেট নেই কেন?

দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের বেশিরভাগের পোশাক হয় শাড়ি, নয় তো সালোয়ার-কামিজ। শাড়ি আর সালোয়ার-কামিজে পকেট থাকে না। পক্ষান্তরে পুরুষের পোশাক শার্ট, প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, যার প্রতিটিতেই পকেট থাকে। কেন পুরুষের পোশাক পকেটযুক্ত আর নারীর পোশাক পকেটহীন? কারণ, 'পকেট' মানে 'অর্থ'। পুরুষের তৈরি সমাজ কাঠামোয় এ সত্য নির্মাণ করা হয় যে, টাকাপয়সা, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের 'অর্থনৈতিক এলাকা' কেবল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাই পুরুষ নারীর পোশাক থেকে পকেটকে 'নাই' করে দিয়েছে, যাতে অর্থের ওপর নারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ তৈরি না হয়। পুরুষের টাকা এত বেশি যে কেবল পকেটে কুলায় না, উপচে পড়ে; এ জন্য তার বাড়তি ব্যাগ দরকার। কী নাম ব্যাগটির? 'মানিব্যাগ'। এ প্রত্যয়টি আবারও 'মানি' বা 'অর্থ' বা 'অর্থনীতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে, মেয়েদেরও একটি ব্যাগ থাকে, যার নাম মানিব্যাগ নয়, ভ্যানিটি ব্যাগ। বাংলা একাডেমির অভিধানে ভ্যানিটি ব্যাগের বাংলা করা হয়েছে 'প্রসাধনপেটিকা, ছোট আয়না, প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি রাখার জন্য ক্ষুদ্র থলে...'। এতেই বোঝা যায় যে, কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নারীর পোশাক এবং অভিধান-ব্যাকরণ দুটোই পুরুষদের ইচ্ছেমাফিক তৈরি করা হয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে পুরুষরা তার মনগড়া রূপ, সৌন্দর্য আর প্রসাধনের মতো তুচ্ছ কাজে নারীকে আটকে রাখতে চায়। অথচ কে না জানে, এক গার্মেন্টস খাতেই ৪০ লাখের বেশি নারী কাজ করে। নারী আজ সরকারপ্রধান, সংসদের স্পিকার, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য, রাষ্ট্রদূত,

নির্বাচন কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সচিব-যুগ্মসচিব, সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং উড়োজাহাজ ও ট্রেনের চালক। চিকিৎসক, অধ্যাপক, প্রকৌশলী তো নারীদের মধ্যে হাজারে হাজার। কাজেই সময় এসেছে পুরুষের তৈরি পোশাকের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার; পকেট সংযুক্ত করে নারীর পোশাকে অর্থনীতির নতুন মাত্রা যোগ করার আর পুরুষতান্ত্রিক ব্যাকরণ পালটে ফেলার।

খ. মোটরসাইকেল : কেন দুই পা এক দিকে?

মোটরসাইকেলে প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ বাইক চালাচ্ছে আর মাঝখানে সন্তানকে রেখে নারী পেছনে বসে পথ চলছে। কোনো পুরুষ যখন বাইকের পেছনে বসে, তখন দুই পা দুই দিক দিয়ে বসে। এটাই বিজ্ঞানসম্মত এবং নিরাপদ বসার ভঙ্গি। কিন্তু নারীকে দুই পা একই দিকে দিয়ে বাইকের পেছনে বসতে হয়। বসার এ ভঙ্গি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। বোঝার চেষ্টা করি, কেন নারীরা এভাবে বসে? আসলে নারীর এই বসার ভঙ্গিটিও ঠিক করে দিয়েছে পুরুষবাদিতার দোষে দুষ্ট এ সমাজ। পুরুষ মনে করে, নারীর দুই পা দুই দিক দিয়ে বসা 'শোভন' দেখায় না; পুরুষের চোখে নারীর বসার এ ভঙ্গিটি অশ্লীল, সাহসী ও দম্ভপূর্ণ। পুরুষরা নারীর এসব বৈশিষ্ট্য মেনে নিতে নারাজ, যে কারণে তারা নারীর বাইকের পেছনে বসাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে দেয়।

তবে সময় পালটাচ্ছে। আজ অনেক নারী মোটরসাইকেল বা স্কুটি চালিয়ে অফিসে যান। অনেক নারী এখন রাইডার হিসেবে অ্যাপভিত্তিক মোটরসাইকেলও চালান। তারা হামেশাই পেছনে যাত্রী বসাচ্ছেন। অনেকে পেছনে সন্তান, আত্মীয় বা ভাইকেও বসাচ্ছেন। এভাবে সমাজের বেঁধে দেওয়া নারী-পুরুষের গতানুগতিক ভূমিকার বদল হচ্ছে। নারী এখন 'পেছনের যাত্রী' থেকে 'সামনের চালক'। আর কে না জানে, চালকের আসনে সামনে বসলে দুই পা এক দিকে দেওয়া যায় না, দুই দিকেই দিতে হয়।

যৌন হয়রানি এবং শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া

আমাদের দেশের মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার। আমাদের কিশোরী মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পথে তারই বয়সী আরেক কিশোর দ্বারা উত্ত্যক্ত হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনার প্রতিবাদ করায় কিশোরীর মায়ের গায়ে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়ার মতো ঘটনারও সাক্ষী হতে হয়েছে আমাদের।

মেয়েশিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পেছনে যৌন হয়রানি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েশিক্ষার্থীদের জন্য এটা জীবন ঝুঁকিও তৈরি করছে। মেয়েরা পথেঘাটে, বিদ্যালয়ে, মোবাইল ও ফেসবুকে, সর্বোপরি ভার্চুয়াল জগতে যৌন নিগ্রহ ও নিপীড়নের শিকার হয়। এক শ্রেণির পুরুষ টিজিং, আপত্তিকর টেক্সট মেসেজ, নোংরা ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে মেয়েদের হয়রানি করে। এর ফলে অনেক মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। আবার কেউ কেউ দুঃসহ সামাজিক ট্রমাতে ভুগছে। এ পরিস্থিতিতে অনন্যোপায় হয়ে অনেক অভিভাবক কিশোরী মেয়েদের পড়ানো বন্ধ করে দিচ্ছে বা অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি হলেও শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। যাতায়াতের ব্যয়, নিরাপত্তা, সময়, শারীরিক কষ্ট সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণার জন্ম হয়,

যা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাগালের মধ্যে স্কুল না থাকায় কিংবা স্কুলের অবস্থান অতি দূরে থাকায় শিক্ষার্থীরা যোগাযোগের সমস্যায় পড়ে।

এর প্রভাব পড়ছে নারীশিক্ষায়। মাধ্যমিকে এসে এখনও ৪১.৫২ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ছে। 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৮' প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে শতকরা ৩৮ দশমিক ৩০ জন মেয়ে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে।

দারিদ্র্য, পারিবারিক অসচেতনতা, বাল্যবিয়ে, স্কুলে যাতায়াত সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তা না থাকাকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অনগ্রসরতার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হলো উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে নারীশিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি। এটা কতটা ভয়াবহ তার প্রমাণ মেলে সম্প্রতি করা জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউএন ওমেনের এক জরিপে। অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের নেতৃত্বে পরিচালিত ওই জরিপে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ৭৬ ভাগ ছাত্রীই কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার ৮৭ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ৭৬ শতাংশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬ শতাংশ এবং মেডিকেল কলেজে ৫৪ ভাগ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হন। ফলে অনেক নারীশিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনুকূল পরিবেশের অভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট একটি রায় ঘোষণা করেন। ওই রায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠনের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশে কোন কোন আচরণকে যৌন হয়রানি বলা যাবে, এর প্রতিকার, কমিটির দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়। যদিও সেই নির্দেশ বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই মানে না।

জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা সুরক্ষা করে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা একটি মানুষকে মানসম্পন্ন আচরণ শেখায়। জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ বজায় থাকলে তা যে কোনো সংস্থাকে একটি মানসম্মত অবস্থায় উন্নীত হতে সহায়তা করে। তাই এটি বাংলাদেশের উন্নয়নেরও মূলমন্ত্র।

বাল্যবিয়ে

বিশ্বে বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এই অবস্থান শীর্ষে। ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েশিশুদের বিয়ে এবং অল্প বয়সে মা হওয়ার কারণে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। তাদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, কখনো বা একেবারেই সমাপ্ত হয়ে যায়। ফলে মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধির আশঙ্কাও বাড়ে। শিক্ষাজীবন থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার কমে আসার ক্ষেত্রে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা।

বাল্যবিয়ের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। যেসব সম্প্রদায়ে একটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে অবশ্যই যৌতুক দিতে হয়, সেসব সম্প্রদায়ে যত তাড়াতাড়ি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যায়, ততই যৌতুক কমার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জরিপের তথ্যমতে, উত্তরের চরাঞ্চলে ও বরেন্দ্র এলাকায় ২০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৭৪ শতাংশেরই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়। এর কারণ হিসেবে তারা দারিদ্র্য, মেয়েদের নিরাপত্তা, পরিবারের সম্মান রাখার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ইত্যাদির কথা বলছে।

মাসিক স্বাস্থ্যের অব্যবস্থাপনার কারণেও আমাদের দেশের অনেক মেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, স্কুল থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার অন্যতম বড়ো কারণ মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুবিধার অভাব। আমাদের দেশে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিশোরীবান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে মেয়েদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা ও গোপনীয়তা না থাকায় অনেক মেয়ে মাসিককালে ক্লাসে যায় না। এভাবে অনেকে পিছিয়ে পড়ে এবং এক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যখন মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, তখন তাদের পক্ষে বাল্যবিয়ে থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন হয়ে যায়।

নিরাপত্তাহীনতা এখনো বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চহার, বাল্যবিয়ে, কিশোরী মাতৃত্ব, যৌতুক ও মাতৃমৃত্যুর মতো সংকটের দিকে নারীদের ঠেলে দিচ্ছে। অল্প বয়সে বিয়ে হলে একটি কন্যাশিশু তার স্বপ্নময় সোনালি শৈশব আর চঞ্চলমনা দুরন্ত কৈশোর জীবনের স্বাদ পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় শিক্ষার আলো থেকে, বাধাগ্রস্ত হয় তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। এমনকি মানুষ হিসেবে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হতে পারে না। ফলে হাজারো নির্যাতন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ বুঝে সহ্য করে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের ব্যাপক পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে এই বাল্যবিয়েরই প্রভাব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতা, নিরক্ষতা, অসচেতনতা, দারিদ্র্যসহ আরও নানাবিধ সমস্যার কারণে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে রোধ করা আজো সম্ভব হয়ে ওঠে নি, যা আমাদের জীবন ব্যবস্থার ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে।

বাল্যবিয়ে আজ আমাদের সমাজে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। তাই বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ থেকে এর মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত কর্মসূচির। সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একসঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা প্রয়োজন। মোটকথা মেয়েশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া, শিশুদের মধ্যে অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ঝুঁকি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করতে হবে। শিক্ষাই সমাজে নারীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

সমাজের নানা সনাতন প্রথার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নারী আর পুরুষ পরস্পর অসম সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। শিক্ষায়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে, কর্মসংস্থানে, নিরাপত্তায়, তথ্য প্রাপ্তিতে, জ্ঞান চর্চায়, দক্ষতা ও যোগ্যতায়, সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারে, সম্মান ও মর্যাদায়, স্বাধীনভাবে চলাচলে অসমতা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে।

তাই কেউ হয়ে ওঠে নারী আর কেউ হয়ে ওঠে পুরুষ। এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মূলে আমাদের আঘাত করতে হবে প্রতিনিয়ত। তরুণ প্রজন্মের মেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ শাণিত করা প্রয়োজন অনেক বেশি।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর উদ্যোগে হাজার বছরে গড়ে ওঠা পশ্চাৎপদ সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথার অবসান ঘটানো সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্ম নিতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। প্রয়োজন নিখাদ দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, উদার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈষম্যহীনতা আর নারী-পুরুষের সমতায় গভীর বিশ্বাস। প্রতিনিয়ত চর্চার মধ্য দিয়েই আসলে শতভাগ মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব।

পাঠ্যপুস্তক ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা

নারী-পুরুষের ছাঁচবদ্ধ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে পাঠ্যপুস্তক। রাষ্ট্র ও সমাজে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের চেয়েও পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব বেশি। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অভিভাবকেরও মতাদর্শ নির্মাণে বড়ো ভূমিকা রাখে। শিশুর সামাজিকীকরণ, মানসগঠন কিংবা তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব অন্য গণমাধ্যমের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা সুনির্দিষ্ট সময় ধরে পাঠ্যপুস্তক পড়তে বাধ্য থাকতে হয় বলে শিশুদের ওপর পাঠ্যপুস্তকের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, স্কুল হচ্ছে শিশুর সামাজিকীকরণের এক শক্তিশালী ক্ষেত্র। দেশের বিদ্যমান শিক্ষাকাঠামোয় স্কুলগুলোতে সুর্নিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিংবা ছবিতে লিঙ্গীয় পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। অনেক লেখাতেই পুরুষের ভূমিকাটি প্রধান হয়ে ওঠে আর নারীর প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে অসহায়, দুর্বল আর নিষ্ক্রিয় হিসেবে। পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায়, ছেলেরা ঝুঁকিপূর্ণ, শক্তিশালী ও তুলনামূলকভাবে স্বাধীন কাজে অংশ নিচ্ছে।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সব বই নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর, সমাজে অসমতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী এরকম কথা বলা যাবে না। পাঠ্যপুস্তকের মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটছে। তারপরও দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে এখনো কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইংরেজি বইয়ে 'এফ' দিয়ে শব্দ রচনা করা হয়েছে। সামনে দুটি বালক-বালিকা আছে। বালকের পায়ের কাছে ফুটবল। বালিকার হাতে একটি ফ্রাই প্যান। দুটিই শিশু। একজন মাঠে যাবে খেলতে, স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটাতে ও মনের বিকাশ ঘটাতে; আর তারই বয়সের আরেক শিশুর গন্তব্যস্থল হলো রান্নাঘর, নারীর কথিত আদি ও অনন্ত ঠিকানা। আমরা জানি, লেখক সজ্ঞানে কোনো বৈষম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদাহরণ উপস্থাপন করেন নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদাহরণ দিতে গিয়ে এখানে তার অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবিই উঠে এসেছে, যা তার মনের আকাঙ্ক্ষা। আর বলতে কী, এই মন পুরুষতান্ত্রিক।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষকে শক্তি-সামর্থ্যের প্রতীক এবং নারীকে অধস্তনতা ও নির্ভরশীলতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় পাঠ্যপুস্তকগুলোতে। চালক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক, ক্রেতা ও অর্থদাতা হিসেবে পুরুষকে, আর অন্যদিকে দুর্বল, মুখাপেক্ষী, গ্রহীতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে নারীকে। গণিত বইয়ে আরও দেখা যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রে পুরুষই সম্পদের মালিক এবং সে তার সম্পদ পরিবারের সবাইকে বণ্টন করে দিচ্ছে। সেখানে তার স্ত্রীর নামের উল্লেখ নেই কিংবা থাকলেও স্ত্রী গ্রহীতার ভূমিকায়। আবার অধিকতর কষ্টকর কাজ গবাদিপশু পালনে পুরুষ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর কাজ ডিম সংরক্ষণে

নারীকে দেখানো হয়েছে অষ্টম শ্রেণির কৃষিশিক্ষা বইয়ে। যদিও ডিম সংরক্ষণ কোনো অংশেই খাটো কাজ নয়, কিন্তু কৃষিতে সাধারণত নারীর শ্রমকে গৌণ, অদৃশ্য, আংশিক ও সহকারীর ভূমিকায় দেখানো হয়; যেমন, ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইয়ে দেখানো হয়েছে নারী তার কৃষিকাজরত স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। অথচ হাজার বছর ধরে কৃষিতে নারীই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। ফলে কৃষি ও গৃহস্থালির কাজে নারীর শ্রমকে গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরে এটাকে একটি উৎপাদনশীল ও অর্থকরী কাজ হিসেবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়।

পাঠ্যবইয়ে এমন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যা নারী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করবে। আবারও বলছি, এটি অভিযোগ নয়। ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্রে পুরুষ আর দুর্বল চরিত্রে নারীকে উপস্থাপন করার যে প্রবণতা পাঠ্যপুস্তকের সর্বত্র দেখা যায়, তা কোনো ষড়যন্ত্র নয়, ইচ্ছাপ্রসূত নয়; সিলেবাস প্রণয়নকারী ও লেখকগণ নিজেদের অজান্তেই তাদের চিরায়ত ধারণাটি এখানে উপস্থাপন করে বসেছেন। তবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইচ্ছা করলেই যখন-তখন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি কাজ করতে হয়। প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ। কোনো পাঠ্যপুস্তক করার আগে কারিকুলামবিদগণ ঠিক করেন তাঁরা শিক্ষার্থীদের কী কী শেখাতে চান। কোন ক্লাসে কী শেখাতে চান। কোন ধ্যানধারণায় তাদের বড়ো করতে চান। কোন ধরনের নাগরিক আমাদের প্রত্যাশিত, দেশ ও নতুন বিশ্বের চাহিদাই বা কেমন নাগরিক। কারিকুলাম প্রণয়নে এসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

পক্ষান্তরে মেয়েরা কেবল গৃহস্থালির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকছে। কন্যা-জায়া-জননীর গৎবাঁধা চরিত্রের বাইরে নারী চিত্রিত হয় ডাকিনী, ছেলেভোলানো বুড়ি অথবা পরি-অপ্সরা হিসেবে। পাঠ্যপুস্তকে মেয়েশিশু বা নারীর এ ধরনের একপেশে নির্মাণ শিশুর মনোজগতে পুরুষতান্ত্রিকতার স্থায়ী বীজ রোপণ করতে পারে। জেন্ডার পক্ষপাত ও নারী-পুরুষ সম্পর্কে প্রথাবদ্ধ ধারণাগুলো শিশুদের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়। এভাবে সমাজকাঠামো জেন্ডার-বৈষম্য জিইয়ে রাখে; যেমন, কৃষি পড়বে ছেলেরা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি পড়বে মেয়েরা। প্রচলিত পাঠ্যসূচি এই পার্থক্যসূচক কর্মপন্থাকে জোর দেওয়ার অনুমোদন দেয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখা হয় কিংবা একেবারেই তা বাদ দেওয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ 'নারী' শীর্ষক অধ্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শিক্ষানীতির এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিকসংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাধ্যমিক স্তরের শেষের দুই বছরের পাঠক্রমে জেন্ডার স্টাডিজ এবং প্রজননস্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে-নির্বিশেষে সবার পুরো স্বাধীনতা থাকবে এবং সব বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনো বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন গার্হস্থ্য অর্থনীতি) মেয়েদের উৎসাহিত করা বা ঠেলে দেওয়া যাবে না।'

আসলে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ভেতর থেকে আমরা চিন্তা করি বলেই নারীর অধস্তন রূপটি আমরা লক্ষ করি না। শ্রেণিবিন্যস্ত আর বৈষম্যমূলক এ সমাজকাঠামোয় পুরুষও নানা বৈষম্য আর

নির্যাতনের শিকার, কিন্তু সমাজকাঠামোর প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান আরও নিচে, আরও প্রান্তে। যে কোনো বৈষম্যের প্রথম শিকার হয় নারী; সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেও নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এ কাঠামোটিই টিকিয়ে রাখতে চায়। এ কাজে পরিবার, আইন কিংবা সমাজের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ভূমিকা রাখে। পাঠ্যপুস্তকে তাই আমরা নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ দেখি; নারীর অধস্তন, দুর্বল, অসহায় আর নির্ভরশীল রূপটি দিনের পর দিন পুনরুৎপাদিত হতে দেখি। এভাবে জেন্ডারের সামাজিকীকরণে পাঠ্যপুস্তক যে ভূমিকা রাখছে, তার ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী। দরকার নারীর গতানুগতিক ও অধস্তন অবস্থানের বিপরীতে পাঠ্যপুস্তকে নারীর ইতিবাচক, প্রগতিশীল ও আধুনিক ইমেজ তুলে ধরা।

এসব পরিবেশ একদিনে তৈরি হয় নি। এটিও একটি সংস্কৃতি, তবে নেতিবাচক সংস্কৃতি। নারী-পুরুষ সবার জন্য সমতার সমাজ গড়তে হলে এককভাবে সম্ভব নয়, অল্প কজন উদ্যোগ নিলেও তা সম্ভব নয়। এজন্য পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। আর তার প্রধান মাধ্যম হলো পাঠ্যপুস্তক। আমাদের শিক্ষার হার ক্রমাগত বাড়ছে। অতএব সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষের প্রতি মানুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মতামত গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তবে কথা হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকে নারী-পুরুষ বা সর্বস্তরে সমতার কথা থাকলেই কি সব হয়ে যাবে? সব শিশু সুস্থ মনমানসিকতা লাভ করতে পারবে? আমরা জানি, এ পথ সংক্ষিপ্ত নয়। সহজও নয়। যে শিক্ষক পড়াবেন তারও সমতায় বিশ্বাসী হতে হবে। পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থাকতে হবে। যিনি বইটি লিখেছেন, তাঁর উপস্থাপনা হতে হবে সমতার লক্ষ্যমুখী।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা আছে। নারী-পুরুষের সমতার কথা আছে। ক্রমান্বয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শিশুদের সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তোলা চাই।

নারীর নিরাপত্তা ও সংবেদনশীলতা

দিন বদলেছে। বদলেছে সমাজও। কিন্তু নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় নি। সারা পৃথিবীতে কবি-সাহিত্যিকরা একদিকে নারীর স্তুতি করেছেন অসাধারণ উপমায়; অন্যদিকে, নারীর নিন্দা করেছেন অশালীন বাক্যবাণে। নারী এখনো প্রতিশোধ গ্রহণের হাতিয়ার। আগের দিনেও যুদ্ধের অন্যতম কৌশল ছিল নারীর প্রতি সহিংসতা, এখনো তাই। পাশের বাড়ির সঙ্গে সীমানা বিরোধ, প্রতিশোধের লক্ষ্য নারী। সামাজিক বিরোধেও হাতিয়ার নারী। এমনকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের হাতিয়ারও নারী।

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই সংকটটি কেবল ব্যক্তি মানসের নয়। সমাজেরও। রাষ্ট্র ও সমাজ যখন নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন নারীর অসহায়ত্ব প্রবল হয়ে ওঠে। সময়ের বিবর্তনে, শিক্ষার প্রসারে সমাজের একাংশ নারীর অগ্রসর হলেও বড়ো অংশের নারী এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছেন। সংসারের সাতপাক সেরে যখনই তারা বেরিয়ে আসতে চাইছেন, তখনি সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে থমকে যাচ্ছেন সদর দরজার চৌকাঠে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যখন বাড়ছে, বলা হচ্ছে 'অর্থনীতির চাকায় তৃণমূলের নারীরা সম্পৃক্ত না হলে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন হতো না'। কিন্তু এই লাখ লাখ নারী যারা উন্নয়নের চাকা ঘোরাচ্ছেন, তাদের একান্ত নিজের চাকাটি কেমন করে ঘুরছে সেটি বিবেচনায় না আনলে সমাজের গভীরের মৌলিক পরিবর্তনটি

সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, নারীর সত্যিকারের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্মানিত করতে পারলেই কেবল গোষ্ঠীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘর হচ্ছে নারীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অথচ ঘরেই তাকে হতে হয় সহিংসতার শিকার। ঘরেও নারীকে দেখতে পাই হুমকির মুখে। যুগের পর যুগ নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করা হচ্ছে। আর এর পরিণতি হচ্ছে ভয়াবহ সহিংসতা। আমরা কি জানি, কতজন নারী ধর্ষিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? আমরা কি জানি, কতজন ধর্ষক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক? সংবাদপত্রে কয়টা দেখা যায়? ভয়াবহ পাশবিকতার অসংখ্য ঘটনা আমরা জানতে পারি না। দিনের পর দিন নারীরা এসব নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে।

অনেক সময় নারী নির্যাতনের সংবাদ একপেশে হয়। গণমাধ্যমকে আরও বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে। নারীকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। নারীকে যৌনতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না। সংবাদপত্রে নারীকর্মীর সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। নারীকে উপকারভোগী হিসেবে না দেখে পরিবর্তনের সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। সহিংসতা নারী বা পুরুষের কারও জীবনের অংশ হতে পারে না। একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সমাজ প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দেয় পুরুষ ও নারীর সুরক্ষা আলাদা। তাই নারী নির্যাতনের বিষয়ে সমাজের বিবেককে জাগিয়ে তুলতে হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় কিছু সুপারিশ

ক. পাঠ্যপুস্তক/পাঠ্যবিষয় নির্বাচন

- পাঠ্যবিষয়ের জেন্ডার অসংবেদনশীল শব্দ/ভাষা যথাসম্ভব পরিহার করা (রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি, গৃহিণী);
- পাঠ্যবিষয়ের জন্য এমন কোনো কবিতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প নির্বাচন না করা, যা পুনরায় জেন্ডার অসংবেদনশীলতা এবং জেন্ডার-বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে (আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/ থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।/ পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই/ একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই!);
- পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত প্রচলিত ও জেন্ডার-বৈষম্য সৃষ্টিকারী ছবি (যা জেন্ডার বিভাজিত ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে) পরিহার করা;
- শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে জেন্ডার, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী অধ্যায়/পাঠ সংযুক্ত করা;
- শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া।

খ. ভৌত কাঠামো/অবকাঠামো

- নারী ও পুরুষ শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা এবং নারীদের জৈবিক চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদের টয়লেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

গ. নিয়োগ প্রক্রিয়া

- প্রাথমিক পর্যায়ে অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক নিয়োগ অব্যাহত রাখা এবং উচ্চতর পর্যায়েও এ ব্যবস্থা চালু করা;
- শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা;
- প্রার্থীর সাক্ষাৎকারকালে জেন্ডার সংবেদনশীল মনোভাব বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করা;
- নারী শিক্ষকের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বদলির ক্ষেত্রে তাদের মতামতের প্রাধান্য দেওয়া।

ঘ. শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মসূচি

- শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বিশেষ করে যৌতুক, টিজিং ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন প্রচারণা চালানো।

ঙ. ছাত্র-শিক্ষক জেন্ডার সংবেদনশীলতা

- শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের রূঢ় আচরণ পরিহারে পদক্ষেপ নেওয়া;
- শ্রেণিকক্ষে ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে দেখা, কাউকে প্রাধান্য না দেওয়া।

চ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- শিক্ষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; বিশেষ করে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ চর্চায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন চলাকালীন বা শিক্ষা পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার, সেলাই, নার্সারি, কৃষি, মৎস, কুটিরশিল্প, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পাঠ্যসূচিতে আরও যা থাকা উচিত

- নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের মানুষকেই চিন্তাশক্তি দ্বারা চালিত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের উন্নয়ন কিংবা দারিদ্র্য দূরীকরণের এজেন্সি হিসেবে দেখতে হবে; গৌণ গ্রাহক (Passive receiver) হিসেবে দেখলে চলবে না। অর্থাৎ তাদের চিন্তা বা মনোজগতে পরিবর্তন এনে এই বিষয়ে সক্রিয় করে তোলা দরকার। আর এটি সম্ভব শিক্ষার দ্বারা। তবে অবশ্যই সেটি মুখস্থ (বা নকল) করে সদনদপত্র সংগ্রহের শিক্ষা নয়, জ্ঞান অর্জন এবং এই জ্ঞানকে (বা দক্ষতাসহ সংগৃহীত তথ্যকে) যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করে জীবনমানে পরিবর্তন আনতে পারার মতো মানসম্পন্ন শিক্ষা। সেখানে নারী অধিকার, মানবাধিকার ও অন্যান্য সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ও

কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ও থাকবে। থাকবে স্বাস্থ্য, পরিবেশসহ অন্যান্য বিষয়ের ন্যূনতম জ্ঞান ও নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করবার জন্য একটি ভাষার ওপর দখল।

- মেয়েদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন সংস্কৃতি ও প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে নারী-পুরুষের সমতার ধারণাভিত্তিক পাঠ্যসূচি তৈরি ও প্রচলন করা; যাতে ছেলে-মেয়ে জীবনের শুরু থেকেই নারীর ব্যক্তি অধিকার তথা মানবাধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

- বিদ্যালয়ে যাতে কম বয়সী বিবাহিত ও সন্তান ধারণকারী মেয়েরা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থায় তার জন্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা রাখা। যাতায়াত, যানবাহন, দারিদ্র্য মোকাবেলা, পরিবেশের নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ, সরকার তথা রাষ্ট্র— সকলকে যার যার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তবে আমরা জানি, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং সরকারি প্রচেষ্টাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

- যে সকল ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সেগুলো হলো নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, তরুণীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও আইনগত কঠোরতা এবং প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন গবেষণায় ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে, পরিবারে তরুণী মেয়েদের নানাভাবে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর প্রতি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। নারী নির্যাতনমুক্ত সংস্কৃতি গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক স্লোগানকে বাংলাদেশে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি নারী ও মানবাধিকার আন্দোলন, সংগঠন, এনজিও, নাগরিক সমাজ, সচেতন মহল— সকলকে বিশেষ আগ্রহ, উদ্যোগ ও যথাযথ সচেতনতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

- শিক্ষা, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ বা উন্নয়নমূলক কোনো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধি এবং এ ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশু সনদের ধারা ২৮ পূরণ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় যোগদান এবং সমাপ্ত করা এবং ২০২৫-এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলের বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মেয়েদের বিশেষ শিক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে; যেমন, পোশাক শিল্পে কর্মরত তরুণীদের।

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি ব্যবস্থায়ও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। তরুণীদের জীবনের এই সময় বয়ঃসন্ধিকাল। সেজন্য তাদের যথাযথ জ্ঞান ও শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা দরকার। এগুলো পাঠ্যসূচিতেও থাকা দরকার।

- মেয়েশিশুর মানবাধিকার বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে থাকা এবং এ বিষয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংবেদনশীল ও সচেতন হওয়া জরুরি। মনে রাখা দরকার যে, মেয়েশিশুর মানবাধিকারই নারীর অধিকার আর নারী অধিকারই মানবাধিকার। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারক, আইনপ্রণেতা ও

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমরা যদি এভাবে মানুষের জীবনচক্রের সূচনা ও প্রাথমিক পর্যায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিচর্যা করি, যদি আজকের মেয়েশিশু তথা ভবিষ্যতের নারীর জীবনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও তার কারণসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করি এবং তা দূর করার জন্য পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, আইনগত, সাংস্কৃতিক-চেতনাগত, দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে উদ্যোগ নিই, তা হলে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হওয়াটা মোটেও অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ ক্ষেত্রে যুবসমাজের সোচ্চার ভূমিকার পাশাপাশি সরকার-রাষ্ট্র-প্রশাসন, নীতিনির্ধারক, আইনজ্ঞ, বিচারকসহ সচেতন সবাইকে আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে হবে। সবার সম্মিলিত উদ্যোগেই কেবল একটি মানবিক সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে নারীরা শিশু অবস্থা থেকেই সংকট ও শঙ্কামুক্ত পরিবেশে বিকাশ লাভ করতে পারবে, যার পরিণতিতে নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব হবে। সম্ভব হবে নারীর পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।

চিররঞ্জন সরকার অ্যাডভোকেসি এনালিস্ট, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেইঞ্জ কর্মসূচি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com

তথ্য-সহায়িকা

1. Gender-Sensitive Education for a Better World, Namtip Aksornkoo. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007
2. Gender issue's importance in development: A Bangladesh Perspective, Munira Binte Iqbal, 2014
3. Gender Disparities in Secondary Education in Bangladesh, Molla Huq, International education Studies, May 2017
4. Why gender sensitivity is still the call for the day, Dibarah Mahboob, The Dailystar, 22 February, 2016
5. Changing norms about gender inequality in education: Evidence from Bangladesh, Niels-Hugo Blunch, Maitreyi Bordia Das, Demographic Research, Volume 32, January 2015
6. Gender-Responsive Classrooms Need Gender-Sensitive Teachers, UNESCO, 2017
7. Bangladesh: Gender Equality Diagnostic of Selected Sectors, Asian Development Bank, 2018
8. Understanding Menstrual Hygiene Management & Human Rights, Human Rights Watch 2017
9. Gender-sensitive Education, Masum Billah, Objerver, 17 September 2016